গণতন্ত্র-নির্বাচন-সামরিক শাসনঃ

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দুষ্টচক্র

ডঃ মোহাম্মদ ওমর ফারুক

সৌজন্যঃ **নাবিক** নিউজলেটার (নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৯০)

বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে দীর্ঘতম ক্ষমতাসীন শাসক হিসেবে জেনারেল এরশাদের অবশেষে পতন ঘটলো। এ মাসেরই প্রথম দিকে তিনি বিরোধী দলগুলোর আন্দোলন ও অবরোধের মুখে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেও নিজের আসনকে সংহত রাখতে ব্যর্থ হয়ে ইস্তফা দেন। বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদ নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দায়িত্বে নিযুক্ত হয়েছেন।

গত দু'মাস ধরেই এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে নতুন এক উদ্দীপনা আসে। বিরোধী দলগুলো বেশ মরিয়া হয়েই নামে। তাদের উদ্যোগে নিয়মিত হরতাল, জ্বালাও-পোড়াও অভিযান আর তার বিপরীতে সরকারের, বিশেষ করে শিক্ষাঙ্গনগুলোতে, হঠকারী ভূমিকা দেশব্যাপী এক নৈরাজ্য ও অচলাবস্থার সৃষ্টি করে। এবারের সরকারবিরোধী আন্দোলনে ছাত্র সমাজ ঐক্যবদ্ধতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। অবশেষে বিরোধী দল সমূহ এবং ছাত্র সমাজের এক ও অভিন্ন দাবীর কাছে জেনারেল এরশাদ নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

ক্ষমতায় থাকাকালীন জেনারেল এরশাদকে সরানো যতটা কঠিন মনে হয়েছিল, ঘটনার ক্রমপরম্পরায় তা ঠিক প্রতীয়মান হয়নি। আরও একবার প্রমাণ হোল যে, কারও ক্ষমতার আসনই স্থায়ী নয়, অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্যও নয়। এটাও আর একবার প্রমাণ হোল যে, ক্ষমতার পরিবর্তন বাংলাদেশে খুব যে কঠিন তা নয়। মূল পরীক্ষা হবে এবং সমাগত দিনগুলোতে পর্যালোচনার বিষয়বস্তু হবে, আরও একবার কি আগের মতই নিছক ক্ষমতার পরিবর্তন হোল, না জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনের আরেক স্বর্ণতোরণ উন্মোচিত হয়েছে।

এরশাদের ইস্তফার খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথেই কোন কোন মহলে উল্লাসের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রে ইলেকট্রনিক নেটওয়ার্কে একটি বাণী পাওয়া গেল যাতে এই পরিবর্তনের মাধ্যমে বাংলাদেশে গণতন্ত্র ও মুক্তির নতুন ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়। বাণীটি শেষ হয়, 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' এবং 'জয় বাংলা' দিয়ে। বাণী প্রেরণকারীর আশাবাদের সাথে অনেকেই বাস্তবতার দৃষ্টিতে একমত নাও হতে পারেন। একমাত্র ভবিষ্যতই বলতে পারবে, এটা কি নিছক ক্ষমতার পরিবর্তন কি না। তবে অতীত যদি ভবিষ্যতের ঈঙ্গিত বহনকারী হয় তাহলে আমাদের আশাবাদের ব্যাপারে আরও সতর্ক হওয়া দরকার।

প্রথমতঃ এরশাদের পতন ঘটানোর ক্ষেত্রে বিরোধী দলগুলো ঐক্যবদ্ধভাবে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু, একথা সবারই জানা যে এরশাদের পতনের সংবাদে জনগণের মাঝে প্রাণ ঢালা উল্লাস দেখা গেলেও আপামর জনসাধারণের এ আন্দোলনে অংশগ্রহণ ছিল অত্যন্ত সীমিত পর্যায়ে। তাই এ আন্দোলন পরিপূর্ণ একটি গণ আন্দোলনে পরিণত হয়নি। রাজনৈতিক দলগুলো যদি জনগণের যথার্থ প্রতিনিধিত্ব করতো তাহলেও এ আন্দোলনের সম্ভাবনাময় ইতিবাচক দিকগুলো আরও স্পষ্ট হোত।

দ্বিতীয়তঃ এ আন্দোলনকে স্বৈরতন্ত্র বিরোধী এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে নিবেদিত বলে কেউ কেউ মনে করলেও এটি একটি হাস্যকর প্রস্তাবনা মাত্র। আমাদের দেশে সম্প্রতি ক্ষমতাচ্যুত এরশাদ সরকার যেমন গণতন্ত্রের ধারে কাছে ছিল না, তেমনি আওয়ামী লীগ ও জাতীয়তাবাদী দল দুটোও গণতন্ত্রের ব্যাপারে পরীক্ষিত শক্তি।

পাকিস্তানে গণতন্ত্র, নির্বাচন আর সামরিক স্বৈরতন্ত্রের যে রাজনৈতিক দুষ্টচক্র বা দুষ্টাবর্ত (political vicious cycle) ১৯৭১ সালের আগেও ছিল এবং এখনো চলছে, সেই দুষ্টচক্রের অবসান ও জনগণের ন্যায়ানুগ অধিকার আদায়ের লক্ষ্যেই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। বলা বাহুল্য, স্বাধীনতা আন্দোলনে মুখ্য ভূমিকা পালনের দাবী ও স্বীকৃতি নিয়ে আওয়ামী লীগ মরহুম শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধীন একটি দেশের ভবিষ্যৎ বিনির্মানের দায়িত্ব গ্রহণ করে। কিন্তু শেখ মুজিবের সরলতা এবং দেশ ও জনতার প্রতি তার মমত্ববোধের ছায়াতলে চার বছরে ক্ষমতাসীন দল হিসেবে আওয়ামী লীগ যে স্বৈরতন্ত্রের বিভীষিকা থেকে যেন মুক্তির আস্বাদ পায়। কিন্তু ১৫ই আগষ্ট সেই রাজনৈতিক দুষ্টচক্রের অবসান ছিল না। তাই মরহুম জেনারেল জিয়াউর রহমানের শাসনকালেও গণতন্ত্রের নামে ও পোষাকে স্বৈরতন্ত্র আবার নতুন ভাবে আবির্ভাব হয়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিবেশকে তার আমলে ভাঙ্গন আর দলীয় রাজনীতির ক্ষমতাকেন্দ্রীক কলুষতার এক নতুন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়। জনগণ প্রেসিডেন্ট জিয়ার শাসনামলকে কিছুটা ভিন্ন চোখে দেখে, তার ভারতবিরোধী ও জাতীয়তাবাদী ভূমিকা, আপাতঃদৃষ্টিতে ধর্মনিরপেক্ষতা থেকে ইসলামের দিকে সরে আসা এবং ব্যক্তিস্বার্থে অর্থনৈতিক দুর্নীতি থেকে তার দূরে থাকার কারণে। শেখ মুজিব সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা হ্রাস করতে চেয়েছিলেন দলীয় ক্ষমতার প্রসার ও সামরিক বাহিনীর বিকল্প সৃষ্টির মাধ্যমে। প্রেসিডেন্ট জিয়া সামরিক বাহিনীকে আনুষ্ঠানিকভাবে রাজনৈতিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসেন। তার রাজনীতি ও প্রশাসন ধারারই অনিবার্য শিকার হন তিনি। তার হত্যার মাধ্যমে বাংলাদেশে জেনারেল এরশাদের নতুন যে প্রশাসনের আবির্ভাব হয়, সেটাও রাজনৈতিক দুষ্টচক্রের নতুন এক অধ্যায় মাত্র।

এরশাদ সরকারের পতন নতুন আশাবাদের উল্লেখযোগ্য নিয়ামক হওয়া সূদুর পরাহত। অতীতে এবং এখনো যারাই ক্ষমতায় এসেছেন বা আসতে চেয়েছেন সবাই স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও জনগণের প্রতিনিধি হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েই এসেছেন। কিন্তু ক্ষমতায় এসে সবাই বাংলাদেশে স্বৈরতন্ত্রের

ইতিহাসে নতুন নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করেছেন মাত্র। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের দলীয় রাজনীতির অঙ্গনে তেমন কোন নিষ্ঠ গণতন্ত্রকামী শক্তির পদচারণা নেই। আওয়ামী লীগ অথবা জাতীয়তাবাদী দলের মত রাজনৈতিক শক্তিগুলো ক্ষমতায় গিয়ে গণতন্ত্রী আদর্শ ও নীতিমালা বজায় রাখতে পারে না, কারণ কথায় বললেও বাস্তবে হয় তারা কেউই গণতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী নয়, অন্যথায় তারা কেউই গণতন্ত্র বলতে কি বোঝায় তা জানে না। যারা নিজেদের দলীয় আভ্যন্তরীণ পরিবেশে গণতন্ত্র অনুশীলন করে না, যারা সন্ত্রাস আর 'জোর যার মূল্লুক তার' নীতি সদাসর্বদা প্রয়োগ করে থাকে, তাদের মাধ্যমে এই রাজনৈতিক দুষ্টচক্রের অবসান আশা করা বাতুলতা। ৭৫-এর ১৫ই আগষ্টের পর গত ১৫ বছরে আওয়ামী লীগের চরিত্রের যেমন পরিবর্তন হয়নি, তেমনি ৮১-র পর হয়নি জাতীয়তাবাদী দলের চরিত্রের পরিবর্তন।

বাংলাদেশের আপামর ইসলামমুখী জনতার জন্য দুঃখজনক হলেও সত্য যে ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামীর কাছে থেকেও এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্নতর কিছু আশা করা কঠিন। জনগণের ন্যায্য গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা আর পাকিস্তানের অখন্ডত্ব - এ দুয়ের টানাপোড়েনে জামাত দ্বিতীয়টাই বেছে নেয়। কিন্তু নীতিগত বা রাজনৈতিক পর্যায়ে না থেমে দুঃখজনকভাবে ৭১ সালে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর সাথে সক্রিয় ও সশস্ত্র সহযোগীতা করে জামাত যে ভূমিকা পালন করে তা আর যাই হোক গণতান্ত্রিক চরিত্রের উৎসাহব্যঞ্জক কোন পরিচয় নয়। গত দু' দশকে বাংলাদেশকে মেনে নিয়ে জামাত বাংলাদেশে পুনর্বাসিত ও সুসংগঠিত হয়ে তৃতীয় বৃহত্তম রাজনৈতিক ধারায় পরিণত হতে এবং বাংলাদেশে ইসলামপ্রিয় জনগণের মাঝে একটি উল্লেখযোগ্য আসন নিজের জন্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হলেও, প্রয়োজনে গণতন্ত্র বিসর্জনে, তা আভ্যন্তরীণ পরিবেশে অথবা জাতীয় রাজনীতিতে হোক, জামাত দ্বিধান্বিত হয় না বলেই অনেকের কাছে প্রতীয়মান। এই সত্যটিই ৮৩ সালে ইসলামী ছাত্র শিবিরের ভাঙ্গনের মধ্যে বিশেষভাবে ধরা পড়েছে। স্মরণযোগ্য, নির্বাচনে অংশগ্রহণ বা করার অমোঘ প্রতিশ্রুতি বিগত নির্বাচনে যে দুটি দল ভঙ্গ করে তার একটি ছিল আওয়ামী লীগ আর অপরটি হচ্ছে জামায়াতে ইসলামী। অনেকেই পাকিস্তানে জেনারেল জিয়াউল হকের সরকারে জামাতের মন্ত্রীত্ব গ্রহণের মত অনেক দৃষ্টান্ত টেনে জামাতের গণতান্ত্রিক নিষ্ঠার ব্যাপারে সন্দিগ্ধতা পোষণ করেন, কারণ কর্মকৌশল ও দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে বিভিন্ন দেশে জামাতের মধ্যে তেমন কোন ভিন্নতা নেই।

আগামীতে নির্বাচন যদি অনুষ্ঠিত হয় তার ফলাফল কি হয় তা বলা মুশকিল। এরশাদ অত্যধিক বাড়াবাড়ি না করে চাতুর্যের সাথেই ক্ষমতা ছাড়লেও তিনি আবার তার জাতীয় পার্টি নিয়ে আসন্ন নির্বাচনে তার অংশগ্রহণ হয়ত বিরোধী দলগুলোর চাপে সম্ভব হয়ে উঠবে না। আওয়ামী লীগের চেয়ে অধিক জনপ্রিয় হলেও, বাংলাদেশের দূষিত রাজনৈতিক পরিবেশে যে ধরণের কার্যকরী সংগঠন দরকার তা অনেকের দৃষ্টিতেই জাতীয়তাবাদী দলের নেই। তাছাড়া ভারত ঘেঁষা না হওয়া ছাড়া আওয়ামী লীগের থেকে জাতীয়তাবাদী দলের চারিত্রিক কোন

স্বাতন্ত্র্য নেই। তাই বাংলাদেশে এরশাদোত্তর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ আবার ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত হলে অবাক হবার কিছু থাকবে না। আর সেটা হয়ত হবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দুষ্টচক্রের আর এক অনিবার্য ট্র্যাজেডীর অধ্যায়। তাই বিস্মিত হবার কিছু নেই যে এরশাদোত্তর বাংলাদেশে সত্যিকার গণতন্ত্রের উত্তরণ এবং দেশের রাজনৈতিক দুষ্টচক্রের অবসান হবে সে সম্পর্কে বক্তব্য রাখা, গণতন্ত্রের প্রতি নিজেদের নিবেদিত হওয়া, এবং বিগত আওয়ামী শাসনের পুনরাবৃত্তি না করার প্রতিশ্রুতি দেয়া ও শপথ নেয়ার পরিবর্তে, এরশাদের ক্ষমতাচ্যুতির অব্যবহিত পরেই শেখ হাসিনা তার বিবৃতিতে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে শেখ মুজিবের হত্যার বিচার করার অমোঘ ঘোষণা দেন।

আওয়ামী লীগ যখন শেখ মুজিবের হত্যার বিচারের দাবী তোলে, সুবিচারপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় তাতে মেলে না। বাংলাদেশে কি শুধু শেখ মুজিবের অথবা জিয়া হত্যার বিচার হওয়া উচিৎ? সিরাজ শিকদার, কর্ণেল তাহের থেকে শুরু করে আরও কত জানা-অজানা ব্যক্তি যারা ব্যক্তিগত, সরকারী, দলীয়, অথবা বিশেষ গোষ্ঠীগত প্রতিহিংসা আর অবিচারের শিকার হয়েছে, তাদের বিচারের দাবী তোলার নৈতিক দায়িত্ব কাদের? আসলে বিশেষ ব্যক্তিদের হত্যার দাবী তোলায় সাময়িক রাজনৈতিক সুবিধা অর্জন হতে পারে, কিন্তু তা জাতীয় স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে না। প্রকৃত পক্ষে, কোন অন্যায় হত্যাই আমাদের সুবিচারের দাবীর তালিকা থেকে বাদ পড়া উচিৎ নয় এবং সব অপরাধীর যথাযথ ও আইনানুগ বিচারের ব্যবস্থা আমাদের সবার সামষ্টিক ও জাতীয় দায়িত্ব।

এবার নির্বাচনে সামরিক বাহিনীর পক্ষ থেকে হস্তক্ষেপের মত অর্বাচীনতা বা দেখানোটাই স্বাভাবিক। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে যারাই ক্ষমতায় আসুক, তাদের নীতি, কর্মকৌশল ও আচরণ অতীতেরই পুনরাবৃত্তি হলে তারা আবারও কোন না কোন ভাবে প্রত্যাখ্যাত হবে নিঃসন্দেহে। পাকিস্তানে বেনজীর ভূট্টোর নজীর সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বাংলাদেশে যে কোন রাজনৈতিক শক্তি অথবা আবার জেনারেলদের দৌরাত্ম্য আবারও প্রত্যাখ্যাত হলেও তাতে আমাদের রাজনৈতিক দুষ্টচক্রের অবসান হবে কি না সে বাস্তব প্রশ্নটি থেকেই যাবে। বাংলাদেশে বৈদেশিক শক্তির প্রভাব ও রাজনৈতিক দুষ্টচক্রের অবসান প্রচলিত রাজনৈতিক পরিবেশ ও দলীয় রাজনীতির কাঠামো এবং দূষিত রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আদৌ সম্ভব কিনা এবং হলে কিভাবে, এ সম্পর্কে সব নিষ্ঠ গণতন্ত্রকামীর মধ্যে গভীর, মুক্ত ও গঠনমূলকভাবে আলোচনা শুরু হওয়া প্রয়োজন। একই সাথে যারা ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সব কিছু ভাবেন ও মূল্যায়ন করেন, তাদের জন্যও নতুন করে ভাববার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দুষ্টচক্রের অবসানের লক্ষ্যে যে কোন প্রয়াস ও গঠনমূলক চিন্তা-ভাবনার প্রথম সোপান হচ্ছে জাতি হিসেবে আমাদের এ আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলা যে এ কাজটি দুঃসাধ্য, তবে অসম্ভব নয়। জাতি হিসেবে আমাদের এমন কোন গুণ ও সম্ভাবনার অভাব নেই যা অন্যান্যদের রয়েছে। একই সাথে আমাদের চিন্তা-ভাবনা সংকীর্ণ স্বার্থভিত্তিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের উর্দ্ধে নিয়ে যেতে হবে।

আমাদের এই দুর্ভাগ্যজনক দুষ্টচক্রের একটি মৌলিক উৎস হচ্ছে, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মকান্ডে সততা ও সুবিচারের অভাব। যারা সমাজের ভিত্তি জনগণের প্রতিনিধিত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে চান, তাদের কার্যক্রমে ও আচরণে এটা প্রমাণিত হওয়া দরকার যে তারা যা বলেন সত্যি তা বিশ্বাস করেন। গণতন্ত্র কখনোই প্রতিহিংসা, দাঙ্গাবাজী, আর 'জোর যার মুল্লুক তার' মন্ত্রের রাজনীতি নয়। জনগণের প্রতিনিধিত্ব কখনোই সামরিক শাসকদের মাধ্যমে আসতে পারে না। গণতন্ত্র শুধু বিরোধী দলের শ্লোগানের বিষয়বস্তু নয়। আজ যারা গণতন্ত্রের ধ্বজা হাতে স্বৈরাচারী এরশাদ প্রশাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন, তাদের সবারই গভীর আত্মসমালোচনা করা প্রয়োজন। জামাতের মুখে গণতন্ত্রের কথা শুনলে মনে পড়ে একাত্তরের বিভীষিকার কথা; আওয়ামী লীগের মুখে গণতন্ত্রের ধ্বনি শুনলে মনে পড়ে চার বছরে আওয়ামী-বাকশালী দুঃস্বপ্নের কথা; জাতীয়তাবাদী দলের মুখে গণতন্ত্রের আওয়াজে প্রতিধ্বনিত হয় সামরিক ব্যরাকের ঝন্ঝনানি।

আমাদের রাজনৈতিক অসততার আরেক অন্যতম উৎস হচ্ছে, আমাদের দলীয় রাজনীতিতে বৈদেশিক শক্তির প্রত্যক্ষ প্রভাব। কোন রকম চক্ষুলজ্জা না রেখে আওয়ামী লীগ যখন ভারতীয় স্বার্থের ধ্বজা ধরে তখন সত্যিই কি এতে আওয়ামী লীগের মর্যাদা এবং প্রভাব বাড়ে? জাতীয়তাবাদী দলই কি বৈদেশিক প্রভাবমুক্ত? আর ইসলামী শক্তির মধ্যে জামাতই কি কোন স্বাতন্ত্র্যের দাবীদার?

নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়ের সম্ভাবনার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী উৎকন্ঠিত হচ্ছে জামাত। বাংলাদেশের একটি নেতৃস্থানীয় সাপ্তাহিকের দেয়া খবরে জানা যায় যে মাস দুয়েক আগে বাংলাদেশে সৌদী দূতের ব্যক্তিগত সেক্রেটারী এবং জামাত নেতা জনাব আবু নাসেরের সাথে জামাতের সেক্রেটারী জেনারেল জনাব মতিউর রহমান নিজামী আমেরিকা সফর করেন এবং তাদের ভ্রমনসূচীর মধ্যে ছিল যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের দক্ষিণ এশিয়ার বৈদেশিক সাবকমিটির চেয়ারম্যান স্টিভেন সোলার্জ এবং স্টেট ডিপার্টমেন্টে বাংলাদেশ ডেস্কের সাথে সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা করা। পর্যবেক্ষকরা মনে করেন, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মৌলবাদী শক্তির ব্যাপারে আমেরিকার ভীতি হ্রাস এবং বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণে অনুপ্রাণিত করার জন্য জামাত নেতৃবৃন্দ প্রয়াস চালাচ্ছে। উল্লেখযোগ্য যে, বছর দেড়েক আগে সোলার্জের বাংলাদেশ সফর কালে দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তির সাথে আলাপ-আলোচনা হয় যার মধ্যে আওয়ামী লীগও ছিল। বিশ্বের পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে আমেরিকার নতুন প্রতিপত্তি বিবেচনা করে, যা থেকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনও মুক্ত নয়, জামাত প্রচলিত রাজনৈতিক প্রজ্ঞার নামে সবদিকই খোলা রাখছে। তাছাড়া সৌদী রাজতন্ত্রের সাথে অন্তরঙ্গ সৌহার্দ্য বজায় রেখে, আমেরিকাকে এড়ানো অনেকটা 'ধরি মাছ, না ছুই পানি'র মত। বৈদেশিক প্রভাব, বিশেষ করে সৌদী রাজতন্ত্রের প্রত্যক্ষ, কদর্য প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে এবং প্রচলিত দলীয় রাজনীতির কাঠামো ও পরিবেশ পরিত্যাগ করে, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি নিজেদের নিষ্ঠতার ব্যাপারে জনগণের মাঝে আস্থা সৃষ্টি করতে পারলে বাংলাদেশের জনগণের কাছে তারা হয়ত আরও গ্রহণযোগ্য

হোত। কিন্তু জামাতের কর্মকান্ড ও কর্মধারার প্রেক্ষাপটে সে আশা দুরাশার নামান্তর।

আমাদের নিম্নতম সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও ঔদার্যের ভিত্তিতে এই স্বীকৃতিটুকু থাকা দরকার যে আমাদের দেশের সব দলেরই গুণ ও দোষ-অপূর্ণতা আছে। আমাদের দুষ্টচক্রের সত্যিই যারা অবসান চান তাদের কি এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করার সুযোগ আছে যে আমাদের কলুষতাপূর্ণ সমাজ ও রাজনীতিতে সবারই কিছু হিস্যা আছে। এরশাদের এই পতনকে যদি আমরা একটি দুর্লভ সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করতে চাই তাহলে আমাদের সবাইকে রাজনীতির অঙ্গনে সংহতি, সহমর্মিতা, সহযোগীতা, এবং ন্যায়পরায়ণতার এক নতুন ধারা গড়ে তুলতে হবে।

যারা ইসলামে বিশ্বাস করেন, জাতির স্বার্থে, দুঃস্থ জনগণের স্বার্থে একটি অন্যতম বৃহৎ মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রে জীবনের সার্বিক পর্যায়ে যথার্থ জনকল্যাণমুখী ইসলামী মূল্যবোধের পরিচয় ও স্বাক্ষর রাখা বিশেষ করে তাদের এক মৌলিক দায়িত্ব।

[লেখক যুক্তরাষ্ট্রের Upper Iowa University-তে অর্থনীতি ও ফাইন্যান্স-এর একজন অধ্যাপক।]

===

Personal Homepage: http://www.globalwebpost.com/farooqm
Genocide 1971: http://www.globalwebpost.com/genocide1971
Kazi Nazrul Islam Page: http://www.nazrul.org